আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়
ইতিহাস বিভাগ
চতুর্থ সেমেস্টার
সি সি - ৮

সামরিক বিপ্লব

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছিল । পরবর্তী দুই শতকে নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ, সামরিক কৌশলের পরিবর্তন, বন্দুক ও কামানের ব্যবহার সামরিক ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী ছিল । নতুন ধরণের সামরিক সংগঠন ও যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল রাজনীতি ও সমাজেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল । এই পরিবর্তনের মূলে ছিল বারুদের ব্যবহার । আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার, গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর উত্থান, দুর্গ নির্মাণে পরিবর্তন, সামরিক বাহিনীর সংগঠন ও প্রশিক্ষণ ছিল এই বিপ্লবের বিভিন্ন দিক ।

সামরিক বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা প্রথম দিয়েছিলেন মাইকেল রবার্টস । তিনি এই বিপ্লবকে ১৫৬০ - ১৬৬০ এই সময়ের মধ্যে বেঁধে দিয়েছিলেন । তাঁর বর্ণিত বিপ্লবের চারটি প্রধান দিক ছিল ; প্রথমত, যুদ্ধের কৌশলে বৈপ্লবিক পরিবর্তন । পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনীর সংগঠন ও সঞ্চালনে এই পরিবর্তন ধরা পড়েছিল । নতুন কৌশল প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হত সুশিক্ষিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ একটি বাহিনী । ব্যক্তিগত শৌর্যের চাইতে বাহিনীর সংহত সংগঠন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । এর ফলে প্রয়োজন হয় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী (Standing Army) প্রতিষ্ঠা করার । দ্বিতীয়ত, সামগ্রিকভাবে রণকৌশল (strategy) -এর পরিবর্তন হয়। অনেক বাহিনীকে একত্রে ব্যবহার করে বড়ো আকারের যুদ্ধ পরিচালনা করা ও বিজয় নিশ্চিত করা ছিল এই রণকৌশলের অঙ্গ । তৃতীয়ত, যুদ্ধের মাত্রা এখন অনেক ব্যাপক হয় এবং যুদ্ধ অনেক বড়ো আকার নেয় । অনেক সৈন্যবাহিনী একসঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে । ফলে একটি সৈন্যবাহিনী দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করার পুরোনো ব্যবস্থা পাল্টে যায় । চতুর্থত, যুদ্ধের বর্ধিত আকার এবং সৈন্যসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে যুদ্ধের সামাজিক প্রভাব-ও অনেক গভীর হয় । ব্যাপক ধ্বংস, বড়ো যুদ্ধ চালানোর খরচ, বৃহৎ সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার প্রশাসনিক দক্ষতা শাসকশ্রেণী ও সমাজকে এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয় ।

পঞ্চদশ শতক থেকে যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয় তার মূলে ছিল বারুদের ব্যবহার । সোরা, কাঠকয়লা ও গন্ধক দিয়ে তৈরি বারুদ অন্য অনেক কিছুর মতো প্রথম আবিষ্কৃত হয় চীনদেশে । এই প্রযুক্তি পরে সম্ভবত আরবদের হাত ঘুরে ইউরোপে আসে। ত্রয়োদশ শতকের শেষে ও চতুর্দশ শতকের প্রথমে অনেক আরব ও ইউরোপীয় সূত্রে গোলা-বারুদের উল্লেখ পাওয়া যায় । রজার বেকন (আঃ ১২১৪-১২৯২ খ্রিঃ) পটকা সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে মনে হয় তিনি বারুদের সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতেন । ১৩২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি অলংকরণে ইউরোপে প্রথম গোলা ছোঁড়ার একটি যন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় । মনে হয় প্রথম দিকে এই গোলা দুর্গের কাঠের দরজা ভাঙার কাজে লাগত । পুরোনো ভারী পাথর ছোঁড়ার যন্ত্র এবং অন্যান্য অবরোধের অস্ত্র পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকেও ব্যবহৃত হত । কিন্তু শতবর্ষের যুদ্ধের শেষদিকে কামানের ব্যবহার দেখা যায় । ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে কামানের গোলায় ক্ষতিগ্রস্ত অবরুদ্ধ দুর্গ আত্মসমর্পণে বাধ্য হয় । ১৪৩৭-এর নথিতে দেখা যাচ্ছে যে কামান ব্যবহার করে দুর্গের দেওয়াল পুরোপুরি ধ্বংস করা হচ্ছে । এই সাক্ষ্য থেকে মনে হয় ১৪৩০ এর পর থেকে ইউরোপের প্রায় সব দেশ কামানের ব্যবহার শুরু করে । হারফ্ল্যর (Harfleur)-এর দুর্গ ১৪১৫-তে ছয় সপ্তাহ এবং ১৪৪০-এ দুই মাস অবরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে । কিন্তু ১৪৪৯ খ্রিস্টাব্দে তারা ভারী কামানের বিরুদ্ধে ২৭ দিনের বেশি লড়াই করতে পারেনি ।

এধরণের সাফল্যের পেছনে কিছু প্রযুক্তিগত কারণ ছিল । প্রথম দিকে কামানের গোলা খুব বেশী দূরে পাঠানো যেত না । পরবর্তী সময়ে লক্ষ্যস্থির করা ও গতির ওপর আরো ভালো নিয়ন্ত্রণ তৈরি হয় । বারুদ তৈরির প্রযুক্তি উন্নততর হয়। আবার লোহা বা সিসার তৈরি গোলা আগে ব্যবহৃত পাথরের গোলা থেকে বেশি কার্যকর ছিল । ধাতুবিদ্যার উন্নতির ফলে অনেক বড়ো আকারের কামান বানানোও সম্ভব হয়েছিল । এই সময়ে ইউরোপে ধাতুর সরবরাহ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল । পঞ্চদশ শতকের শেষে লোহার গোলা ব্যবহার শুরু হয়েছিল । মধ্যযুগের প্রচলিত বর্মের ব্যবহার আগ্নেয়াস্ত্র প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাতিল হয়ে যায় । ধাতুর মধ্যে লোহা ও তামার উৎপাদন অনেকগুণ বেড়ে যায় । প্রথমদিকে বড়ো আকারের কামান সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া সহজ ছিল না । এই কারণেই মধ্যযুগের শেষে যুদ্ধে এর ভূমিকা খুব বড়ো ছিল না । কিন্তু একশো বছর পরে অবস্থা পাল্টে যায়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময় তুর্কিরা ১৪টি বড়ো ও ৩৫৬টি ছোট কামান ব্যবহার

Scanned with CamScanner

করেছিল। এর পর থেকে কামানের ব্যবহার বাড়ে এবং চাকার ওপর বসিয়ে কামান স্থানান্তরিত করাও সহজ হয়। তবুও কামান সেই সময় অর্থাৎ প্রধানত অবরোধের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হত। ইতোমধ্যে বারুদ অবরোধ যুদ্ধের চরিত্র পাল্টে দিয়েছিল। এ ধরণের আক্রমণের থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নতুন দুর্গ বানানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ইটালির স্থপতি ও মানবতাবাদী আলবেরতি ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে মন্তব্য করেন যে দুর্গের প্রাকার করাতের দাঁতের মত অনিয়মিত রেখায় তৈরি করা প্রয়োজন। সুতরাং গোলন্দাজ বাহিনীর থেকে রক্ষা পেতে ষোড়শ শতকেই নতুন ধরনের দুর্গ নির্মাণ শুরু হয়।

নতুন ধরনের দুর্গ নির্মাণের প্রয়াস প্রথমে উত্তর ইটালিতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে সেই স্থাপত্যশৈলী ইউরোপের অন্যত্র প্রসারিত হয়েছিল। ইটালিতে শুরু হয়েছিল বলে এই রীতের দুর্গ ত্রাস ইতালিয়েন নামে পরিচিত হয়। জেফ্রি পার্কার এই দুর্গ নির্মাণ করাকে সামরিক বিপ্লবের এক বিশিষ্ট অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ নতুন আগ্নেয়াস্ত্রের আক্রমণের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের রক্ষণাত্মক ব্যবস্থা গড়ে তোলাও বিশেষ জরুরি ছিল। তাঁর মতে এধরণের কার্যকর রক্ষণাত্মক দুর্গের জন্য সামরিক বিপ্লবের পর্বে জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

পঞ্চদশ শতকের শেষে এবং ষোড়শ শতকের প্রথমে ইটালির ইঞ্জিনিয়াররা এধরণের রক্ষণাত্মক দুর্গ নির্মাণ শুরু করেন। নতুন দুর্গের বৈশিষ্ট্য ছিল **bastion**, দুর্গের দেওয়ালে নতুন ধরণের আক্রমণের স্থান, যার আকৃতি একটি তীরের ফলার মত। দুর্গের দেওয়ালের থেকে ব্যাস্টিয়ন একটু বেরিয়ে থাকত। পরবর্তী দু-শতকে এই নির্মাণরীতি আরো পরিণত ও উন্নত হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত সাফল্য। এ-ধরণের দুর্গের উদ্ভবকে সামরিক বিপ্লবের একটি বৈশিষ্ট্যরূপেই দেখা যায়।

সেনাবাহিনীর সংগঠনেও বড়ো ধরণের পরিবর্তন ঘটে। মধ্যযুগের সেনাবাহিনীর সব থেকে কার্যকরী অংশ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। কিন্তু ক্রমশ পদাতিকরাই সেনাবাহিনীর প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। ম্যাকিয়াভেলির মতো সমসাময়িক লেখকরাও এই মন্তব্য করেছেন। চতুর্দশ শতক থেকেই এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজদের লং-বো পদাতিক সৈন্যের কাছে খুব কার্যকর অস্ত্র ছিল। আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কার হলে পদাতিক বাহিনী আর্কেবুস নামে এক ধরণের বন্দুক ব্যবহার করত। পদাতিক সৈন্যের মূল অস্ত্র ছিল পাইক বা বল্লম বা আর্কেবুস। পাইকের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র যুক্ত হলে পদাতিক বাহিনীর অভ্যুত্থানের চরম পর্যায় শুরু হয়। ১৫২০ খ্রিঃ নাগাদ স্পেনে মাস্কেট ব্যবহার শুরু হয়। এগুলি আর্কেবুসের থেকে উন্নত মানের ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত পাইকের প্রচলন ভালোরকম ছিল। কারণ বন্দুক থেকে একবার গুলি ছোঁড়ার পর দ্বিতীয় গুলি ছুঁড়তে সময় লাগত। এই সময় পাইকধারী বন্দুকধারীকে সহায়তা করত। পাইক ও বন্দুকের এই পরস্পর নির্ভরতার তাত্ত্বিক রূপ দেন স্পেনের সেনাধ্যক্ষ ফ্রান্সিসকো ডি আভালোস।

ফলাফল

স্বাভাবিকভাবেই সামরিক বিপ্লবের বহু রাজনৈতিক-সামাজিক ফলাফল দেখা দিয়েছিল। নতুন যুদ্ধ-রীতি, সামরিক বাহিনীর সংগঠন, ব্যাপক ও কার্যকর আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ইউরোপে রাষ্ট্রের গঠনের ওপর প্রভাব ফেলেছিল। এর ফলে নতুন সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। নতুন অস্ত্র ও যুদ্ধনীতি শাসককে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ও নতুন অস্ত্রের সাহায্যে আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা ধ্বংস করা সহজ হয়েছিল এবং আগ্রাসনের মাধ্যমে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করে নতুন রাষ্ট্রের পত্তন করাও সম্ভব হয়েছিল। এই অর্থে বারুদের ব্যবহার যুদ্ধের উপরে রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল। দেশের ভেতরে সংগঠিত বাহিনী ও সমরাস্ত্রের ওপরে নিয়ন্ত্রণ শাসকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। প্রযুক্তি এবং সাংগঠনিক দিক থেকে নতুন সৈন্যবাহিনী নির্মাণ বড়ো রাজ্যের শাসকের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তাই আধুনিক ইউরোপের প্রাথমিক পর্বে নতুন যুদ্ধনীতি ও সামরিক সংগঠন নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছিল। বলা হত যে রাষ্ট্র যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ রাষ্ট্রকে তৈরি করে।

মধ্যযুগে সামন্তপ্রভুরা নিজস্ব বাহিনী রাখত। বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তপ্রভুর বাহিনী ও তৎপ্রসূত ক্ষমতা অনেক সময় রাজার শক্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখত। এই অবস্থার এবার পরিবর্তন হয়। রাজার কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে পাল্লা দেবার মত রসদ এই সামন্তপ্রভুদের আর ছিল না। সুতরাং নতুন ব্যবস্থায় পুরোনো সামন্তপ্রভুর ক্ষমতার সামরিক ভিত্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ বিষয়টিও রাজার অধীনে নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করেছিল।

রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। এই কর্তৃত্ব ব্যবহার করে রাষ্ট্র নতুন কর বসাত। এভাবে অর্থ সংগ্রহ করে সৈন্যবাহিনী নির্মাণ ও যুদ্ধ

Scanned with CamScanner

করা যেত ।

মধ্যযুগীয় যুদ্ধরীতির অবসানের ফলে পুরোনো নাইটদের শৌর্যের গাথাও ক্রমশ গল্পকাহিনীতে পরিণত হয় । নতুন ব্যবস্থায় শিভালরি-র বিশেষ স্থান ছিল না । যুদ্ধ আর শুধু ব্যক্তিগত বীরত্বের ওপরে নির্ভরশীল নয় ; সংগঠিত, প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত সৈনিকের ওপরে নির্ভরশীল ছিল । ব্যক্তিগত শৌর্যের স্থান এখন নিল প্রশিক্ষণ ও আগ্নেয়াস্ত্র ।

মারণাস্ত্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা যুদ্ধ সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এনেছিল । যুদ্ধের বিধ্বংসী প্রভাব প্রত্যক্ষ করে অনেক সমসাময়িক লেখক শান্তির পক্ষে লিখেছেন এবং যুদ্ধের অনৈতিকতার নিন্দা করেছেন । অ্যানাব্যাপটিস্টরা যুদ্ধের ও হত্যালীলার বিরোধী ছিলেন । আবার অনেকেই সংগত বা ন্যায্য যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন । আগ্রাসন রোধে, বিচার-প্রতিষ্ঠায়, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ প্রয়োজনীয় বলেই মনে করা হয়েছে । কিন্তু মধ্যযুগের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পার্থক্য ছিল এই যে মধ্যযুগে যুদ্ধ ও ব্যক্তিগত শৌর্য রোমান্স-এর বিষয় ছিল । কিন্তু পরবর্তী যুগে যুদ্ধ ক্রমশ ধ্বংস, বীভৎসতা ও গণহত্যার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হল ।

মাইকেল রবার্টস যখন প্রথম সামরিক বিপ্লবের কথা লেখেন তখন তাঁর প্রধান বক্তব্য ছিল যে এই বিপ্লবের কেন্দ্রে ছিল যুদ্ধের কৌশলের সংস্কার । তাঁর ব্যাখ্যার মূল আকর্ষণ এই যে তিনি সামরিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনকে ব্যাপকতর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন । নতুন বাহিনী গঠনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং নতুন আমলাতন্ত্র ভিত্তিক ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর ওপরে নির্ভরশীল রাষ্ট্র নির্মাণ সম্ভব হয় । **জেফ্রি পার্কার** অবশ্য মনে করেন যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সামরিক বিপ্লবের প্রধান কারণ । তাঁর মতে এই বিপ্লবের আসল তাৎপর্য হল ১৫৬০ খ্রিঃ থেকে ১৭৫০ খ্রিঃ-এর মধ্যে ইউরোপের প্রায় বিশ্ব-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ।

P.M.

Scanned with CamScanner